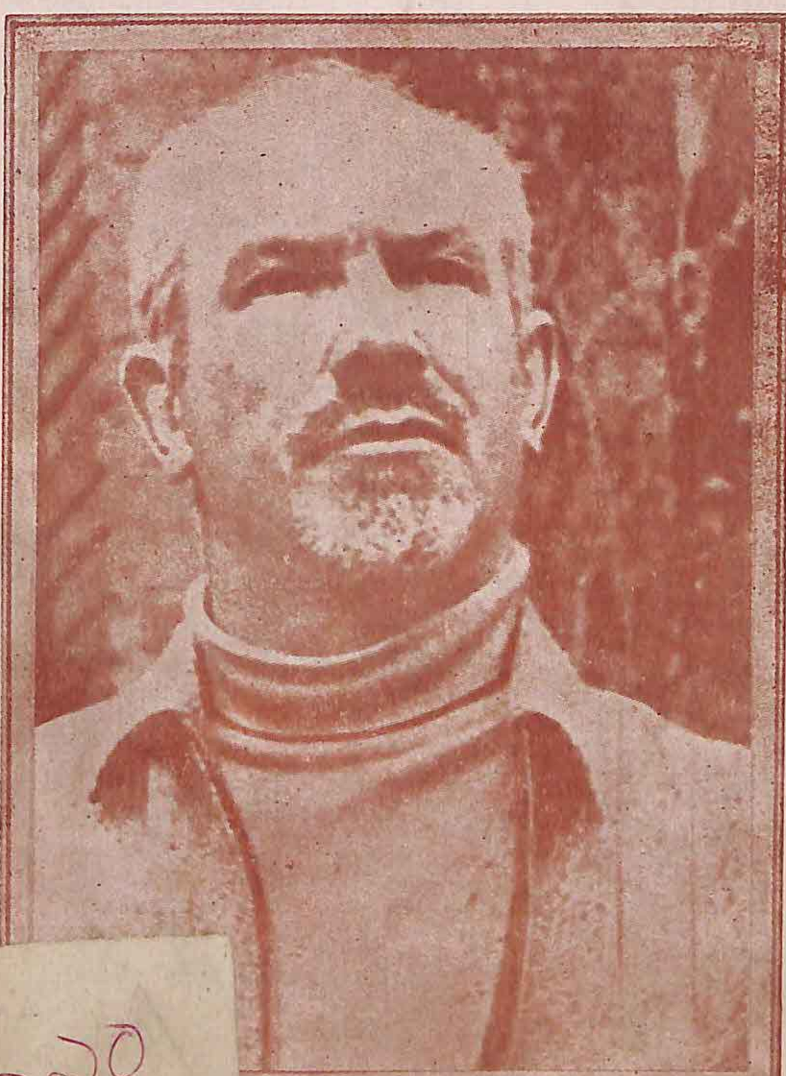
জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা-দুই

অপুষ্টি

ডাঃ গোপাল দাস



জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

১০৬৪

শুভেচ্ছা

'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' বয়সে নবীন হলেও এর ব্যাপ্তি ও সফলতার সম্ভাবনা প্রভূত। বিভিন্ন জীবিকার সমাজ সচেতন ব্যক্তি মিলে গঠিত এই সংস্থা নানা জনমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিকের অপূর্ণতা, বৈষম্য ইত্যাদির কথা এরা অকপটে জনগণকে বলছেন। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন বার্তা জনগণকে জানানো ও তাদের সচেতন করার পাশাপাশি এরা তাদের একথাও বলছেন যে জনস্বাস্থ্যের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে এবং সেটাই মূল লক্ষ্য।

এই সংস্থার একটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা প্রকাশ। প্রথম পুস্তিকা 'পেটের অসুখ' প্রকাশিত হয়েছিল মাস দুই আগে, দ্বিতীয় পুস্তিকা 'অপুষ্টি' এখন প্রকাশের মুখে। প্রথম দুটি পুস্তিকার বিষয়বস্তু হিসেবে উদরাময় বা পেটের অসুখ এবং অপুষ্টির নির্বাচন সবিশেষ সমর্থনযোগ্য এই কারণে যে এ দুটি ব্যাধিই আমাদের দেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে জনজীবনের প্রধান দুই সমস্যা। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসব দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে ন্যূনতম পুষ্টির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে নি, তাদের দেয় নি মানুষ হিসেবে বাঁচার অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের সামান্যতম সংস্থান। তাই অপুষ্টি ও উদরাময় তাদের নিত্যসঙ্গী এবং এই ব্যাধি দুটির পর্যায়ক্রমিক আবর্তনে প্রতি বছর অনুন্নত দেশগুলির এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে ছেদ পড়ে, আরও বেশী সংখ্যার মানুষ জীবন্মৃত ও পঙ্গু হয়ে যায়। আমাদের ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়।

যে দেশের বাসিন্দাদের অর্ধাংশের জোটে খুদ-কুঁড়ো, অপর অর্ধাংশেরও যা জোটে তাকে কোন সংজ্ঞাতেই সুষম খাদ্য বলা চলে না, সেখানে পুষ্টির ওপর স্বল্পায়তন একটি পুস্তিকা লেখা রীতিমত কঠিন এক কাজ। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকে ধন্যবাদ, তারা এমন একজনকে এই কঠিন ভারটি দিয়েছেন, যিনি বয়সে তরুণ হলেও ন্যস্ত দায়িত্ব ভালোভাবে সম্পন্ন করেছেন। 'অপুষ্টি' সহজ বাংলার লেখা একটি ভালো পুস্তিকা এবং সেই কারণেই হাজারে অযুতে ব্যাপকতা পাওয়ার দাবী রাখে।

ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়

18 মার্চ, 1986

রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমাদের কথা

আসন্ন বইমেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের পুস্তকমালার দ্বিতীয় পুস্তিকা 'অপুষ্টি' পুনঃপ্রকাশিত হতে চলেছে। বিগত বছরগুলিতে এই পুস্তিকাটি প্রভূত সমাদর পেয়েছিল আগ্রহী মানুষদের কাছ থেকে। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ তারই ফলশ্রুতি মাত্র। শুধু এই বইটি নয়, অন্যান্য আরো বারোটি পুস্তিকার ক্রমাগত বিক্রয়বৃদ্ধি ও শুভানুধ্যায়ী মানুষদের ধারাবাহিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সাতাশির সায়াহ্নে আমাদের গোড়ার থেকে অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর করে তুলেছে। যাঁরা ফেলে আসা দিনগুলিতে আমাদের অকুণ্ঠ ভরসা দিয়েছেন প্রতিকূলতার পাহাড়গুলি ডিঙোতে, প্রকাশনার তৃতীয় বৎসরে পা দেওয়ার প্রাকমুহূর্তে আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সামনের বছরটিতেও আমাদের নিয়মিত প্রকাশনা আগের মতোই চলবে—এর পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। আশা করি, আমাদের সাফল্যের কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কিশোর মনোরোগীদের সামগ্রিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে একটি বহুমুখী গ্রামীন প্রকল্প সংগঠনার সুসংহত চিন্তাভাবনা বর্তমানে আমাদের সক্রিয় পর্যালোচনার স্তরে রয়েছে। বাস্তবে, এমন কোনো প্রকল্প সমগ্র পূর্বভারতের কোনও রাজ্যেই নেই। এই বিষয়ে সরকারী বেসরকারী সমস্ত স্তর থেকেই শুভেচ্ছা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি। আগামী বছরে, হয়তো বা আপনাদের দ্বারস্থ আমরা হবো এই উদ্যোগকে উপলক্ষ করে। আমাদের ধারণা আমরা প্রত্যাখ্যাত হবো না। আপনাদের সহায়তা ও সমর্থন সম্বল করেই আমরা বিগত সাফল্যগুলির মতো এবারও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পেঁছোবো।

13 ডিসেম্বর, 1987

সুখময় ভট্টাচার্য
কর্মসচিব

প্রথম প্রকাশ : 28 মার্চ, 1986। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মাসিক গণস্বাস্থ্য, বাংলাদেশ।

অপুষ্টি

মানুষের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হলো পুষ্টি। পুষ্টি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে এবং রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে কেউ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে, আবার কেউ অনুন্নত গরীব দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নিজ নিজ দেশের সকল বা বেশীর ভাগ মানুষের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে ও পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টির অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ-গুলিতে অপুষ্টিই অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্ত দেশে বেশীর ভাগ রোগ সৃষ্টির মূলে রয়েছে অপুষ্টি ও তজ্জনিত দুর্বলতা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছে এমন প্রতি রোগী পিছু অন্তত দশজন মানুষ রয়েছে, যারা বিভিন্ন মাত্রায় পুষ্টির অভাবে ভোগে। এরা যে কোন মুহূর্তে (পেটের অসুখ, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে) গুরুতর অপুষ্টির রোগীতে পরিণত হতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বছরে মোট মৃত্যুর অর্ধেকই পাঁচ বছরের নীচের শিশু। পাশাপাশি উন্নত দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার মোট মৃত্যুর শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও 25-30 শতাংশ শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনের প্রথম বছরেই প্রতি হাজারে প্রায় 125 জন শিশুর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এদেশে শুধুমাত্র ভিটামিন 'এ'-র অভাবে প্রতি বছর প্রায় 40,000 শিশু অন্ধ হয়ে যায়। আমাদের হাসপাতালগুলির শিশু বিভাগে 15 শতাংশ শয্যায় সর্বদাই থাকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা। যে দেশে সত্তর শতাংশ লোক দারিদ্র্য

সীমার নীচে বাস করে, অর্ধাহার আর অনাহার যাদের নিত্যসঙ্গী, সে দেশের মানুষের অধিকাংশই যে অপুষ্টিতে ভুগবে এটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষা জনিত অজ্ঞতা ও নানা কুসংস্কার এই সমস্যাকে আরো জটিল ও সংকটময় করে তুলেছে। 'সকলের জন্য পুষ্টি'র বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইও তাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য ও পুষ্টি ঃ

খাদ্যই আমাদের শরীরে পুষ্টির যোগান দেয়। খাদ্যবস্তু আমাদের খাদ্যনালীতে বহু জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরল ও ক্ষুদ্র কণায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত খাদ্য বিশোষিত হয়ে রক্তে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেহকে সচল রাখার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে।

খাদ্যের মূল উপাদান তিনটি—প্রোটিন, শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ (ফ্যাট)। শরীরের যাবতীয় বিপাক ক্রিয়ায় এরা অংশগ্রহণ করে এবং বিপাকের ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জলও বিপাক ক্রিয়ার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়। খাদ্যের এই শক্তি সরবরাহকারী তিনটি উপাদান শরীরের তাপ রক্ষা ও শরীর চালনা এবং শিশু ও বালকের ক্ষেত্রে এসব ছাড়াও দেহকোষের গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও দেহের বিপাকক্রিয়ার জন্য অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলেই এদের প্রয়োজন মেটে।

কতটা পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ?

শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ পরিমাপের একক হলো 'ক্যালরি'। এক গ্রাম প্রোটিন থেকে 4 ক্যালরি, এক গ্রাম শর্করা থেকে 4 ক্যালরি ও এক গ্রাম ফ্যাট থেকে 9 ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ক্যালরি বা শক্তি উৎপাদন করে না। আমাদের দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণকে ক্যালরি দিয়ে হিসেব করা হয়। শুধুমাত্র দৈহিক পরিশ্রম ও শরীর চালনা করতেই যে খাদ্যের প্রয়োজন তা নয়, দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময়ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমাদের ক্ষিদে পায় অর্থাৎ শরীর খাদ্যের প্রয়োজনের কথা জানান দেয়। শরীর ও মনের বাহ্যত বিশ্রামের সময়ও শরীরের বিভিন্ন বিপাকক্রিয়া মন্দগতিতে হলেও চলছে, হৃৎপিন্ড ও শ্বাস-

প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় পেশী সঞ্চালন করতে হচ্ছে, বিভিন্ন হরমোন ও এনজাইম সংশ্লেষিত হচ্ছে এবং বাইরের তাপমাত্রা যাই হোক না কেন, দেহের তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট অঙ্কে বজায় রাখতে হচ্ছে। এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে শরীরের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অবিরাম কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া চালু রাখতে হচ্ছে। শরীর ও মনের পূর্ণ বিশ্রামের সময় শরীরের এই বিপাকের পরিমাণকে বলা হয় 'মৌল বিপাকীয় হার'। এই হার লিঙ্গ ও বয়সভেদে বিভিন্ন হলেও একই বয়স ও লিঙ্গের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোটামুটি এক।

এই ন্যূনতম প্রয়োজনের সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের দেহ চালনার পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অতিরিক্ত প্রয়োজন যোগ করলে আমরা আমাদের দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণ পাই। **কায়িক শ্রম যারা করেন অর্থাৎ গ্রামের কৃষক, কলকারখানার শ্রমিক ইত্যাদি, তাদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত প্রয়োজনের পরিমাণ বেশী।** আবার অফিসের কেরাণী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, স্কুলের শিক্ষক ইত্যাদি যারা মানসিক কাজে নিযুক্ত, তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজনের পরিমাণ কম। **মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও স্তন্যদানের সময় খাদ্যের প্রয়োজন বেশী।** অনেক রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও খাদ্যের প্রয়োজন বেশী হয়। যে কোন ধরনের জ্বর হলে দেহের বিপাকের হার বাড়ে, তাই খাদ্যের প্রয়োজনও বাড়ে। কিন্তু রোগের কারণে ক্ষিদে না থাকায় রোগী উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে হিসেব করে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন নির্ণয় করা সম্ভবপর হলেও তা আয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ। সেই কারণে বয়স, লিঙ্গ এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এক বড় জনসমষ্টিকে সমীক্ষা করে কোন দেশের অধিবাসীদের পুষ্টির প্রয়োজন নির্ণয় করা হয়। 1968 সালের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয়দের গড় দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন নির্ণয় করা হয়েছে। এই হিসেবের সঙ্গে 10 শতাংশ অতিরিক্ত যোগ করে নিতে হবে, কারণ খাদ্য তৈরি, দেহে তার পরিপাক ও আত্তীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রমিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়।

দৈনিক কতটা খাদ্য প্রয়োজন—ক্যালরি হিসেবে* ঃ

বিভাগ		পেশা, বিভিন্ন অবস্থা/বয়স	ক্যালরি	প্রোটিন (গ্রামে)
পূর্ণবয়স্ক পুরুষ	ক)	লেখাপড়ার কাজ	2,400	55
	খ)	মাঝারি পরিশ্রমের কাজ	2,800	55
	গ)	ভারী পরিশ্রমের কাজ	3,900	55
পূর্ণবয়স্কা নারী	ক)	লেখাপড়ার কাজ	1,900	45
	খ)	মাঝারি পরিশ্রমের কাজ	2,200	45
	গ)	ভারী পরিশ্রমের কাজ	3,000	45
	ঘ)	অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা	ক/খ/গ+300	45+10
	ঙ)	স্তন্যদান	ক/খ/গ+700	45+20
শিশু	ক)	0—6 মাস	120/ কিগ্রা	2·3—1·8/ কিগ্রা
	খ)	7—12 মাস	100/ কিগ্রা	1·8—1·5/ কিগ্রা
	গ)	1—3 বছর	1,200	20
	ঘ)	4—6 বছর	1,500	22
বালক	ক)	7—9 বছর	1,800	33
	খ)	10—12 বছর	2,100	41
কিশোর ও তরুণ	ক)	13—15 বছর		
		ছেলে	2,500	55
		মেয়ে	2,200	50
	খ)	16—18 বছর		
		ছেলে	3,000	60
		মেয়ে	2,200	50

* এই হিসেবের সঙ্গে 10% যোগ করে নিতে হবে।

খাদ্যের কোন উপাদান কতটা খেতে হবে?

আমাদের দেহের ক্যালরি চাহিদার মূল যোগানদাতা হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি তার বেশীর ভাগ অংশই শর্করা। সাধারণত খাদ্যে শর্করার পরিমাণ 60—70 ভাগ থাকা উচিত। কিন্তু ভারতীয়দের খাদ্যে এই পরিমাণ 75—90 ভাগ পর্য্যন্ত। স্নেহজাতীয় পদার্থ

বা ফ্যাট আমরা পরিমাণে কম খেলেও এটিও মূলত দেহে ক্যালরির চাহিদা মেটায়। তাই যে সমস্ত খাদ্যে শর্করা ও ফ্যাটের পরিমাণ বেশী, তাদের 'শক্তিদানকারী খাদ্য' বলা হয়। চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্য এবং তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি ফ্যাট বা স্নেহজাতীয়।

প্রোটিন দেহের ক্যালরি চাহিদা মেটাতে সমর্থ হলেও সাধারণত খাদ্যে শর্করা ও ফ্যাটের অভাব ঘটলে তবেই প্রোটিন এই কাজ করে থাকে। প্রোটিন আমাদের দেহে মূলত প্রয়োজন দেহকোষের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি সংশ্লেষণ ও শৈশবকালে দেহকোষের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য। তাই যে সমস্ত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী, তাদের 'দেহগঠনকারী খাদ্য' বলা হয়। মাছ, মাংস, ডিম, সয়াবীন, বাদাম, ছোলা, ডাল ইত্যাদি এই জাতীয় খাদ্য। ডালে প্রোটিনের পরিমাণ (18–25%) গমের তুলনায় দ্বিগুণ ও চাল বা আলুর তুলনায় তিনগুণ। **ডিম, মাছ ও মাংসের তুলনায়ও ডালে প্রোটিন বেশী থাকে। তাই ডালকে 'গরীবের মাংস' বলা হয়।** অবশ্য খেসারির ডাল বেশী খাওয়া উচিত নয়, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই ডাল বেশী পরিমাণে খেলে 'ল্যাথিরিজম্' নামক পঙ্গুত্ব রোগ হয়।

সাধারণ হিসেবে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিন দরকার প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনে 1·5 গ্রাম এবং বয়স্কদের প্রতি কিলোগ্রামে 1 গ্রাম। বয়স্কদের আনুপাতিকভাবে প্রোটিন কম লাগার কারণ তাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দেহের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রোটিন প্রয়োজন, দেহ গঠনের প্রশ্ন সেখানে নেই। প্রসঙ্গত জানা দরকার, **বেশী প্রোটিন খেলে দেহের বেশী পুষ্টি হবে, এই ধারণাটা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয় ; প্রয়োজনের বেশী প্রোটিন খেলে শরীরে বিপাকক্রিয়ায় তা পরিবর্তিত হয়ে শর্করা ও পরে তাপশক্তি এবং মেদে রূপান্তরিত হয়ে যায়।**

সুস্থ, সবল দেহগঠনের জন্য খাদ্যে আরও কয়েকটি উপাদান খুব অল্প পরিমাণে থাকা অবশ্যপ্রয়োজন, এরা দেহের বিভিন্ন বিপাকক্রিয়াকে চালু রাখতে সাহায্য করে। এগুলি হলো—ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। টাটকা শাকসব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি কমপ্লেক্স' ও অন্যান্য ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিন 'বি-12' কেবলমাত্র মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রাণীজাত খাদ্যে পাওয়া যায়। ডাল, ভাত, আটা ইত্যাদিতে তুলনামূলকভাবে ভিটামিনের পরিমাণ কম। ভিটামিন 'সি' যে শুধুমাত্র কমলালেবুতে থাকে

তা নয়, সাধারণ পাতিলেবু, আমলকী বা পেয়ারাতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আম, কলা, পেঁপে, গাজর, টমাটো, সবুজ শাকসব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে, যার অভাবে মানুষ অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন 'ডি' আমাদের দেহেই তৈরি হতে পারে, প্রয়োজন শুধু পর্য্যাপ্ত সূর্যালোকের। ডিম ও দুধে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। আমাদের খাদ্যনালীতে বসবাসকারী জীবাণু থেকেও এক ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায়, যার নাম ভিটামিন 'কে'। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' জলে দ্রবণীয় হওয়ায় খাদ্য তৈরি ও রান্নার সময় এই ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয়। ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে' ফ্যাটে দ্রবণীর বলে লিভার ও অগ্ন্যাশয়-ঘটিত রোগে এই সমস্ত ভিটামিনের অভাব দেখা যায়।

খনিজ পদার্থ আমাদের দেহের হাড় ও দাঁতের গঠন ও বৃদ্ধি, রক্তের স্বাভাবিক চাপ রক্ষা, রক্তের লৌহঘটিত পদার্থ হিমোগ্লোবিন তৈরি, থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ বজায় রাখা ইত্যাদি কাজে লাগে। মাত্র 24 টি খনিজ পদার্থেই আমাদের প্রয়োজন মেটে এবং এর সবগুলিই কমবেশী আমাদের দৈনিক আহার্যবস্তু বিশেষত শাকসব্জিতে বর্তমান। লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড তো আমরা প্রতিদিনই খেয়ে থাকি।

আমিষ খাবেন না নিরামিষ?

আমিষ না নিরামিষ খাদ্য দেহগঠনের উপযোগী এ বিতর্ক বহুদিনের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় যে দেহগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন উভয় খাদ্যেই আছে। প্রত্যেকটি প্রোটিন অণু বিভিন্ন ধরনের বহু-সংখ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। এদের কয়েকটি আমাদের দেহে উৎপন্ন হয় না। তাই আমাদের দৈনিক খাদ্যে এদের সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। এদের বলা হয় 'অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড'। এদের প্রায় সবকটিই জান্তব প্রোটিনে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে এদের পরিমাণ কম এবং কোন একটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। আমাদের দৈনিক আহার্যে কিছু জান্তব প্রোটিন, যথা—মাছ, মাংস, ডিম থাকলে ভাল। বিকল্পে, দু-তিন রকমের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশিয়ে খেলেও সবকটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন মেটে। ডাল-ভাত, ডাল-রুটি বা খিচুড়ি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুষম খাদ্য কী ?

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি, তাতে প্রায় সব উপাদানই কম-বেশী থাকে। যে খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদার যোগান দিতে পারে, দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ বজায় রাখতে পারে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। সুষম খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও জল যথাযথ অনুপাতে থাকে।

অপুষ্টি কী ?

আমাদের দেহে যদি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় ক্যালরি, প্রোটিন, ভিটামিন বা খনিজের অভাব ঘটে, তাহলে তাকে পুষ্টির অভাব বা অপুষ্টি বলা হয়। প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করলে ও খাদ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির যোগান অব্যাহত থাকলে দেহের বৃদ্ধি বা স্থিতাবস্থা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন উচ্চতার লোকদের প্রত্যাশিত দৈহিক ওজনের একটি তালিকা পুষ্টিবিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। ভারতের শিশু-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী এদেশের বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে কোন শিশুর ওজন প্রত্যাশিত ওজনের শতকরা 80 ভাগ পর্যন্ত হলে তাকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। দৈহিক ওজন প্রত্যাশিত ওজনের শতকরা 80-71 ভাগ হলে কম অপুষ্টি, শতকরা 70-61 ভাগ হলে মাঝারি ধরনের অপুষ্টি এবং শতকরা 60 ভাগের কম হলে গুরুতর ধরনের অপুষ্টি বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে যদি কোন শিশু 3 কিলোগ্রাম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে তার ওজন 5 মাসে দ্বিগুণ, এক বছরে 3 গুণ, 2 বছরে 4 গুণ, 3 বছরে 5 গুণ, 5 বছরে 6 গুণ ও 10 বছরে 10 গুণ হবে। সুতরাং একটি 3 বছরের শিশুর ওজন যদি 9 কিলোগ্রামের কম হয়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিশুটি গুরুতর অপুষ্টির রোগী।

সাধারণত পর্যাপ্ত ক্যালরিযুক্ত খাদ্য, তা সে ডাল-ভাত বা মাছ-ভাতই হোক, গ্রহণ করলে তাতে প্রোটিনের পরিমাণও পর্যাপ্ত হয় এবং দেহের পুষ্টির বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি হয়না। অন্যদিকে খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণে ঘাটতি পড়লে প্রোটিনেরও ঘাটতি পড়ে। তাই সাধারণত ক্যালরির অপুষ্টিও প্রোটিন অপুষ্টি একই সঙ্গে ঘটে থাকে। অবশ্য কিছুক্ষেত্রে শিশুদের শুধুমাত্র প্রোটিন অপুষ্টিও ঘটতে পারে।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই অপুষ্টির মূল কারণ ঃ

অপুষ্টির মূল কারণ দারিদ্র্য। অপুষ্টি সৃষ্টিতে অণুজীব ও কৃমি ইত্যাদির কিছু গৌণ ভূমিকা থাকলেও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবেরই কিন্তু মুখ্য ভূমিকা। আমাদের দেশে 70 শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে অর্থাৎ চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থায় তাদের দিন কাটে। সুস্থ জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম খাদ্যের ব্যবস্থাও তাদের কল্পনার অতীত। দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী।

দারিদ্র্যের পাশাপাশি অশিক্ষাও ভারতের মানুষের আর একটি বড় সমস্যা। অশিক্ষা অজ্ঞতার জন্ম দেয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মায়েরা অশিক্ষিত হওয়ায় শিশুর পরিচর্যার ব্যাপারে তাদের নানাবিধ অজ্ঞতা থাকে এবং তাদের শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। জন্মের প্রথম কয়েকমাস শিশু কেবল মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু অনেক মা-ই **জানেন না যে জন্মের পরেই শিশুকে স্তন্যপান করতে না দিলে বুকে দুধ তৈরি হয় না এবং দীর্ঘদিন শিশু স্তন্যপান না করলে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।** অনেক সময় মা বা শিশু গুরুতর অসুস্থ থাকলে, অথবা সংবাদপত্র-টিভি-রেডিওর প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, কিংবা প্রতিবেশীর পরামর্শে মা শিশুকে বেবীফুড খেতে দেন। কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা বা অজ্ঞতার কারণে বেশীর ভাগ সময় শিশুকে পাতলা দুধ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প পরিমাণে খাওয়ানো হয়। কমবয়সী শিশুর অপুষ্টির এটি একটি বড় কারণ।

শিশুর অপুষ্টির আরেকটি কারণ হলো শিশুকে শক্ত খাবার দিতে অনিচ্ছা ও অনাবশ্যক বিলম্ব। তিন চার মাস বয়স থেকে আস্তে আস্তে শিশুকে শক্ত খাবার খাওয়া অভ্যাস করানো উচিত, নাহলে শিশুর পুষ্টির অভাব ঘটবে। কারণ শুধু বুকের দুধে তখন শিশুর প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে শিশু ঐ সমস্ত খাবার হজম করতে পারে না। আবার, অনেক শিশুর পিতামাতার সন্তানের অন্নপ্রাশনে জাঁক জমক করার বাসনা থাকে। অর্থনৈতিক কারণে বেশীর ভাগ সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না, এমন কি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানটুকু পালন করার মতো সামর্থ্যও বহু পিতামাতার থাকে না। ফলে শিশুকে শক্ত খাবার দেওয়ায় বিলম্ব ঘটে।

অনেক সময় আবার অযথা বাছবিচার করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনেক বয়স পর্যন্ত ভাত দেওয়া হয় না। ডাল বা ছানা না দিয়ে শুধুমাত্র এগুলির

জল দেওয়া হয়। সুজি বা রুটি না দিয়ে সুদৃশ্য কৌটায় মোড়া 'ফ্যারেক্স' জাতীয় জিনিষ খাওয়ানো হয়। এ সমস্ত ধারণা শুধু ভুল নয়, শিশুর পুষ্টির পক্ষেও মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর।

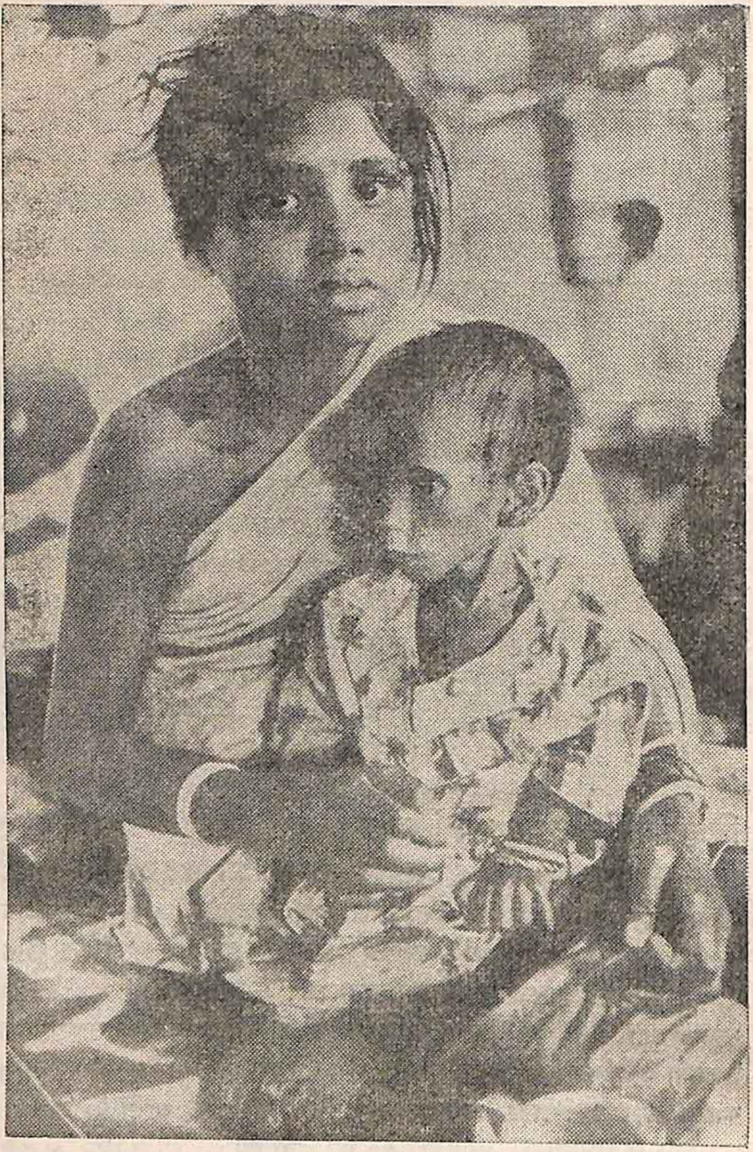
সংক্রামক রোগ ও অপুষ্টি ঃ

অপুষ্ট দেহ রোগজীবাণুর স্বর্গরাজ্য। আমাদের দেশে প্রতি বছর শুধু পেটের অসুখেই 15 লক্ষ শিশু মারা যায়, এদের বেশীর ভাগই অপুষ্টিরও শিকার। অপুষ্ট দেহে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ঠিকভাবে তৈরি হয় না, ফলে সহজেই রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। পেটের অসুখ ছাড়া অপুষ্ট শিশু এবং বয়স্কদের নানা ধরনের অসুখ হয়ে থাকে। প্রায় সব অসুখেই ক্ষিদে কমে যায়, ফলে খাদ্য গ্রহণও কমে যায়। কিন্তু বিভিন্ন সংক্রামক অসুখে প্রোটিনের ক্ষয় ঘটার ফলে দেহে প্রোটিনের চাহিদা বাড়ে। তাই রোগীর পথ্য সম্পর্কে সতর্ক না হলে তার দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি ঘটে।

কিন্তু অসুস্থতার সময় অনেক বাড়ীতেই রোগীকে কম খাদ্য বা তরল খাদ্য দেওয়ার রেওয়াজ আছে। 'জ্বর হলে ভাত খেতে নেই' বা 'পেটের অসুখে কিছু খেতে নেই' ইত্যাদি ধারনা এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এসব ভুল আচরণ অপুষ্টির সম্ভাবনা ও মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। কারণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের যোগান না থাকলে দেহ নিজের শর্করা, ফ্যাট ও প্রোটিনের সঞ্চয় ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। ফলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 'অপুষ্টি—সংক্রামক রোগ—অপুষ্টি' এই অশুভ চক্রের সূচনা হয়।

শিশুরাই অপুষ্টির প্রধান শিকার ঃ

পরিবারে খাদ্যাভাবের মূল প্রকোপ পড়ে মা ও শিশুর ওপর। খাদ্যের ব্যাপারে যে কোন পরিবারে অগ্রাধিকার পায় পুরুষেরা, কারণ পরিবারের ভরণপোষণে তাদের ভূমিকাই বেশী বলে মনে করা হয়। পরিবার যৌথ হলে বা পরিবারে শিশুর সংখ্যা বেশী হলে প্রতিটি শিশুর যথাযথ পরিচর্যার সময় মায়েরা পান না এবং শিশুর খাদ্যেও টান পড়ে। অথচ দেহকোষের বিভাজন ও বৃদ্ধির জন্য শিশুর সুষম খাদ্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। **এসব কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মূলত শিশুরাই অপুষ্টির শিকার।** মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই শিশুদের অপুষ্টি শুরু হয়। এই পর্যায়ে পুষ্টির জন্য শিশু মায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। তাই মায়ের অপুষ্টির



'ম্যারাসমাস' রোগের শিকার—
আমাদের দেশের অগণিত অপুষ্ট শিশুদের
একজন

প্রভাব সরাসরি শিশুর ওপর পড়ে এবং বহু শিশু অপুষ্ট অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।

আমাদের শিশুরা মূলত ক্যালরির অভাবে অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণগত অপুষ্টিতে ভোগে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য না পাওয়ায় ফলে ঘটে প্রোটিন অপুষ্টি। অর্থাৎ আমিষ বা নিরামিষ যে কোন খাদ্যই পরিমাণমত পেলে শিশুর অপুষ্টি ঘটে না। খাদ্যের স্বল্পতা অল্পদিন ধরে ঘটলে দেহ নিজের কাজ-কর্মের অদলবদল ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে পারে। বেশীদিন ধরে খাদ্যের স্বল্পতা চলতে থাকলে দেহ চলাফেরা কমিয়ে ফেলে ক্যালরি চাহিদা কমাতে চেষ্টা করে। মাঝারি ধরনের অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু তাই কম সক্রিয় ও কম উৎফুল্ল থাকে। অপুষ্টি অব্যাহত থাকলে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হতে থাকে। তার উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়, দেহের তুলনায় মাথা বড় হয় ও হাত পা সরু সরু হয়। এরপরও অপুষ্টি চলতে থাকলে বা এই সময় কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে শিশু গুরুতর অপুষ্টির শিকার হয়, তার জীবনে ছেদ পড়ার আশংকা দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় কোন শিশু 4-5 মাস বয়সে উপুড় হতে শেখে, 7-8 মাস বয়সে বসতে পারে, এক বছরের মধ্যে দাঁড়াতে শেষে ও 13-15 মাস বয়সে হাঁটতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপুষ্ট শিশুদের ক্ষেত্রে সবকিছুই দেরীতে ঘটে। গুরুতর অপুষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশুর দেহ অনেক সময় ফুলে যায়। গুরুতর অপুষ্ট শিশুরা দুভাবে সাধারণত নজরে আসে। সরু সরু হাত-পা কঙ্কালসার দেহ নিয়ে (ম্যারাসমাস) অথবা হাত-পা সহ সারা শরীর ফোলা নিয়ে (কোয়াসিঅরকার)। আমাদের দেশে ম্যারাসমাস আক্রান্ত শিশুর সংখ্যাই অধিক।

বেশী অপুষ্ট শিশুর দেহে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থেরও ঘাটতি হয়। লৌহ ও ফলিক অ্যাসিডের অভাবে রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরি ব্যাহত হয় ও রক্তাল্পতা রোগ দেখা দের। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়, বিশেষত পাহাড়ী অঞ্চলে এ রোগ বেশী দেখা যায়। ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স'-এর অভাবে ঠোঁট ফাটে, মুখে ঘা হয়, জিভে লালচে ভাব দেখা দেয়, ত্বক শুষ্ক হয় এবং ত্বকের যে সমস্ত স্থান সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে সেখানে কালচে ছোপ ধরে। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে চোখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়, চোখে ঈষৎ হলদে রং-এর তিন কোণা দাগ দেখা যায় এবং রাতের বেলায় দেখতে পায় না অর্থাৎ রাতকানা হয়ে যায়। অবশেষে

'কর্ণিয়া' বা চোখের মণির পর্দা নষ্ট হয়ে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন 'সি'-র অভাবে দাঁতের মাড়ী ও রক্তজালিকার গঠন ব্যাহত হয়, ফলে মাড়ী দিয়ে রক্ত পড়ে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে ত্বকের নীচে রক্ত জমার ফলে লালচে ছোপ দেখা যায়। ভিটামিন 'ডি'-র অভাবে 'রিকেট্স' নামক রোগ হয়—শিশুর পা বেঁকে যায়, বুকের হাড় সামনের দিকে বেরিয়ে আসে ও মাথা শক্ত হয় না। কিন্তু গুরুতর অপুষ্ট শিশুদের সাধারণত রিকেটস্ রোগ হয় না, কারণ এই রোগ বাড়ন্ত হাড়ে হয় এবং গুরুতর অপুষ্টিতে শিশুদের বৃদ্ধিই ব্যাহত হয়ে যায়। অনেক সময় অপুষ্টি থেকে সেরে ওঠার সময় খাদ্যে ভিটামিন 'ডি' পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে রিকেটস, রোগ দেখা দেয়।

গুরুতর অপুষ্টির রোগীরা প্রায়শই পেটের অসুখে ভুগে থাকে। তাদের দেহে বিভিন্ন এনজাইম উপযুক্ত পরিমাণে তৈরি হয় না এবং আমাশয় ইত্যাদি রোগের অণুজীব সহজেই প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। কম বয়সের শিশুরা দীর্ঘদিন অপুষ্টিতে ভুগলে দেহের হাড়ের বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে ব্যাহত হতে পারে। ফলে রোগমুক্তির পরও শিশুর উচ্চতা স্বাভাবিকেব চেয়ে কম হয়। অপুষ্টিতে শুধু শারীরিক নয়, শিশুর মানসিক গঠনও বিপর্যস্ত হয়। মাতৃগর্ভে থাকার শেষ 7-8 সপ্তাহ ও জন্মের পর প্রথম দু বছর সময়েই শিশুর মস্তিষ্ক দ্রুতগতিতে বাড়ে। তাই এই সময়ে ধারাবাহিক অপুষ্টির কারণে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের অপুষ্টি ঃ

পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে নারীদের অপুষ্টি বেশী দেখা যায়। কারণ সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের ধকল তাদের ওপর দিয়েই যায়। অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানরতা অবস্থায় নিজের জীবনধারণের জন্য শক্তি সংগ্রহের পাশাপাশি শিশুর পুষ্টি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহ মাকেই নিজের শরীর থেকে করতে হয়। দরিদ্র পরিবারে খাদ্যের স্বল্পতার ধাক্কাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীদেরই সামলাতে হয়। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের যোগান না থাকায় শিশুদের পরে নারীরাই অপুষ্টির শিকার। আমাদের দেশে শতকরা 40 ভাগ অন্তঃসত্ত্বা নারী রক্তাল্পতা রোগে ভোগে, স্তন্যদানরতা নারীদের ক্ষেত্রেও এই সংখ্যা কম নয়। অপুষ্টি দ্বারা আক্রান্ত মায়েরা প্রসবকালীন বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হন ও কোন কোন ক্ষেত্রে স্তনে পর্যাপ্ত দুধ তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্ত মায়েরা কম

ওজনের অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেন ও ঘন ঘন সন্তান প্রসব করার ফলে দুর্বল-তর হতে থাকেন। নানাবিধ ভিটামিনের অভাবও তাদের দেহে দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত শিশুদের মত গুরুতর অপুষ্টি দেখা যায় না, কিন্তু অল্প ও মাঝারি ধরনের অপুষ্টি বিরল নয়। অপুষ্ট ব্যক্তির ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়, মাংসপেশী ভালোভাবে গড়ে ওঠে না ও দেহে ভিটামিন-খনিজের অভাবজনিত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। সাধারণত গ্রামের কৃষক বা কলকারখানার শ্রমিক যারা কঠোর পরিশ্রম করেন, তাদের মধ্যেই অপুষ্টি বেশী দেখা যায়। অপুষ্টির ফলে তাদের কাজে উৎসাহের অভাব ঘটে এবং কর্মক্ষমতা ও জীবনীশক্তি হ্রাস পায়।

স্বল্প আয়ের মানুষরা কি খাবেন?

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ মানুষের আয়ই পর্যাপ্ত পরিমাণের নয়। তাই স্বল্প আয়ের মানুষদের নিজেদের ও পরিবারের সকলের পুষ্টির সমস্যা অত্যন্ত গভীর। **অনেকের ধারণা, যে খাবার যত বেশী দামী, সেই খাবার তত বেশী ভালো আর পুষ্টিকর। একথা কিন্তু একেবারেই সত্য নয়।** একটা কমলালেবুতে যতখানি ভিটামিন 'সি', তার সাতগুণেরও বেশী ভিটামিন 'সি' থাকে পেয়ারাতে। একটা কলায় পাওয়া যায় একটা আপেলের দ্বিগুণ প্রোটিন, পাঁচগুণ ফ্যাট, প্রায় দ্বিগুণ শর্করা, বেশী ক্যালসিয়াম, দেড়গুণ ফসফরাস, বেশী ভিটামিন 'এ', তিনগুণ ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' আর চারগুণ ভিটামিন 'সি'। প্রতি 100 গ্রাম মাছে প্রোটিনের পরিমাণ 15-20 গ্রাম (প্রকারভেদে), মাংসে 18-25 গ্রাম (প্রকারভেদে), দুটি ডিমে 10-14 গ্রাম, অথচ প্রতি 100 গ্রাম চীনাবাদামে প্রোটিন থাকে প্রায় 27 গ্রাম, ডালে প্রায় 20-28 গ্রাম (প্রকারভেদে) আর ছোলায় 17-25 গ্রাম (প্রকারভেদে)। মাছ খেতে হলে শুধু যে রুই, কাতলা প্রভৃতি দামী মাছ খেতে হবে এমন ধারণা ভুল, কারণ বেলে, বাটা, খয়রা, খলসে, মৌরলা, গুরজালি, ভোলা ইত্যাদি ছোটখাটো মাছেও প্রোটিনের পরিমাণ কম নয় (প্রতি 100 গ্রামে 16–18 গ্রাম)।

(ক) **পূর্ণবয়স্ক পুরুষ**—একজন 60 কিলোগ্রাম ওজনের মাঝারি পরিশ্রমের পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ক্যালোরির প্রয়োজন দৈনিক প্রায় 2,800 ক্যালরি। রান্না ইত্যাদির জন্য 10 শতাংশ অতিরিক্ত ধরলে এই প্রয়োজন দাঁড়ায় প্রায় 3,000 ক্যালরি। তার প্রোটিন লাগবে 60 গ্রাম অর্থাৎ 240

ক্যালরি আসবে প্রোটিন থেকে। বাকী 2,760 ক্যালরি আসতে হবে শর্করা ও ফ্যাট থেকে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে নীচের তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলে 60 কিলোগ্রাম ওজনের শ্রমিক ব্যক্তিটি সুষম খাদ্য পেতে পারেন—

সকালের টিফিন ঃ 2 খানা রুটি বা পাঁউরুটি (গুড় সহযোগে), একটি পাকা কলা বা 50 গ্রাম ছোলা বা সম্ভব হলে এক গ্লাস দুধ বা একটি ডিম। যারা চা ও বিস্কুট খেতে অভ্যস্ত, তারা তা খেতে পারে।

দুপুরের খাবার ঃ 250 গ্রাম চালের ভাত, 50 গ্রাম ডাল 50 গ্রাম মাছ (যে কোন জাতের) বা একটি ডিম, 100 গ্রাম আলু, 100 গ্রাম শাকসব্জী, দু-এক টুকরো পাতিলেবু।

বিকালের টিফিন ঃ 2টি রুটি বা 100 গ্রাম মুড়ি, এক গ্লাস দুধ বা 50 গ্রাম বাদাম, একটি কলা বা একটি পেয়ারা বা একটি আম। এক কাপ চা ও 2টি বিস্কুট খাওয়া যেতে পারে।

রাতের খাবার ঃ 4টি রুটি, 50 গ্রাম ডাল, 50 গ্রাম মাছ বা একটি ডিম, 10 গ্রাম আলু, 50 গ্রাম শাকসব্জী, পারলে এক গ্লাস দুধ।

(খ) পূর্ণবয়স্কা নারী ঃ ওপরের শ্রমিকের অনুরূপ কাজে নিযুক্ত পূর্ণবয়স্কা একজন নারীর জন্য প্রায় 2,400 ক্যালরির যোগান লাগবে। অর্থাৎ ওপরের তালিকার পাঁচভাগের চারভাগ খাদ্য লাগবে।

(গ) অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী নারী ঃ অন্তঃসত্ত্বা নারীদের দৈনিক ক্যালরি ও প্রোটিন চাহিদা সাধারণ অবস্থার তুলনায় যথাক্রমে 300 ক্যালরি ও 10 গ্রাম বেশী হয়। কিন্তু প্রথম তিন মাস এদের ক্ষিদের ঘাটতি থাকে, তাই পরবর্তীকালে খাদ্যের যোগান বাড়াতে হয়। এই সময়ে বিশেষত লৌহ ও ফলিক অ্যাসিড পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। শাকসব্জী, চাল, ডাল ইত্যাদিতে লৌহ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থের লৌহ দেহে সহজে বিশোষিত হয় না। প্রাণীজাত খাদ্য যথা—মাছ, মাংস, ডিম, মেটে ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ফলিক অ্যাসিড থাকে। একটি

বিরল খাদ্য কাঁকড়ায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। গুড়েও লৌহের পরিমাণ বেশী।

স্তন্যদানকারী নারীদের ক্ষেত্রে প্রথম 6 মাস প্রায় 700 ক্যালরি ও দ্বিতীয় 6 মাস (আমাদের দেশে বহু শিশুই এক বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পান করে) 400 ক্যালরি অতিরিক্ত লাগে। প্রোটিনের চাহিদা 20 গ্রাম অতিরিক্ত থাকে। এছাড়া লৌহের পাশাপাশি বিশেষভাবে নজর দিতে হয় ভিটামিন 'সি'-র ওপর, যা কলা, পেয়ারা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(ঘ) এক বছরের নীচের শিশু ঃ **মায়ের বুকের দুধই শিশুর পক্ষে আদর্শ খাদ্য।** কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায়, তৈরি করার জন্য সময় নষ্ট হয় না. ঠান্ডা বা গরম করার প্রয়োজন নেই বা তৈরি করার পদ্ধতির ত্রুটির ফলে অবিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বুকের দুধে শিশুর পেটের অসুখ বা সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং প্রথম কয়েক মাস (4-5 মাস) এতেই শিশুর পুষ্টির চাহিদা মেটে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম কয়েকদিন যে ঈষৎ হলদে রঙের পদার্থ মায়ের স্তন থেকে বেরোয়, তা শিশুর পক্ষে খুবই উপকারী। এতে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশী থাকে ও এটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। **ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর পক্ষে মায়ের দুধ তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নাই।**

শিশুর জীবনের দ্বিতীয় 6 মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **এই বয়সে শিশুদের অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।** এই সময়ে বুকের দুধের পরিমাণ কমে (দরিদ্র মায়েদের বুকের দুধের পরিমাণ আরও আগে কমে যায়), অন্যদিকে শিশুর খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। **শিশুকে তাই এই সময় শক্ত খাবার দিতে হয়।** 3-4 মাস বয়স থেকে শিশুকে বিস্কুটের গুঁড়ো, মুড়ি ইত্যাদি দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হয়। আলু সেদ্ধ, গলা ভাত, ঘন ডাল, কাঁচকলা সেদ্ধ, ডিমের কুসুম, রুটির মাঝখানের নরম অংশ ইত্যাদি 5-6 মাস বয়স থেকে দিতে হয়। মাছ সেদ্ধ, দুধ, ছানা, পাকা আম, পাকা কলা ইত্যাদিও শিশুকে আস্তে আস্তে খাওয়ানো অভ্যাস করাতে হয়। এক বছর বয়সে শিশু সব খাবার খেতে পারে। প্রথমদিকে এই সমস্ত খাবার খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন জিনিষ বারে বারে দিলে শিশু আস্তে আস্তে এই সমস্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তবে একটা কথা

মনে রাখা প্রয়োজন, শিশুর খাদ্যে ঝাল-মশলা দিতে নেই এবং খাবার যতটা সম্ভব টাটকা হওয়া উচিত।

(ঙ) 1 থেকে 5 বছরের শিশু ঃ এই বয়সের শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কারণ এই সময়ে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত ঘটে। এক বছর বয়সে শিশুর চাহিদা দৈনিক 1,000 ক্যালরি অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক মহিলার ক্যালরি চাহিদার প্রায় অর্ধেক। এক বছরের পর প্রতি বছরে ক্যালরি চাহিদা 100 ক্যালরি করে বাড়তে থাকে। এই বয়সের শিশুদের সমস্ত ধরণের খাদ্য দিতে হয় এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে খেতে বসানো উচিত। এইভাবে শিশু তার প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস নিজেই তৈরি করে নিতে পারে।

(চ) স্কুলের ছাত্রের খাদ্য ঃ 10 থেকে 15 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্যালরি চাহিদা প্রায় বয়স্ক লোকের মতই, তবে তাদের প্রোটিনের চাহিদা বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে স্কুলের ছাত্রদের টিফিনের যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা ছাত্রদের পুষ্টি জোগাতে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থার সাহায্যে ছাত্রদের ক্যালরি চাহিদার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ও প্রোটিনের অর্ধেক অংশ মেটানোই প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

বেবীফুড টনিকের প্রয়োজন নেই ঃ

ভারতের বেশীর ভাগ মানুষ যখন অপুষ্টিতে ধুঁকছে, দুবেলা দুমুঠো অন্নের অভাবে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে, বেবীফুড আর টনিকের ঝকঝকে বিজ্ঞাপনে তাদের প্রলোভিত করার জোর প্রচেষ্টা তখন পুরোদমে চলছে। আজকের দিনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সপক্ষে জোরালো প্রচার করছেন, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর প্রয়োজনীয়তা মানুষ স্বীকার করে নিচ্ছেন। অথচ এদেশের বাজারে স্বাস্থ্যবান শিশুর ছবিসহ সুদৃশ্য মোড়কে বেবীফুড তথা ইনফ্যান্ট ফর্মুলার অবাধ ব্যবসা চলছে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছে বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে এগুলিই সুস্বাস্থ্যের গ্যারান্টি। এইভাবে নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেশী-বিদেশী সংস্থাগুলি মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলত নিঃস্ব হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ, শিশুরা হারাচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য, আর বিনিময়ে স্ফীত হচ্ছে জাতীয় ও বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের সম্পদের পাহাড়।

বেবীফুডের পাশাপাশি ভিটামিন টনিকের রমরমা ব্যবসাও চলছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। সুদৃশ্য বোতলে অল্প দামের ওষুধ বহুগুণ দামে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে, আর সুচতুর চটকদার বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হচ্ছে যে এগুলি নাকি জীবনীশক্তি যোগায়। অথচ একথা সন্দেহাতীত যে **ভিটামিন টনিক বা বেবীফুড সুষম খাদ্যের বিকল্প হতে পারে না। ভিটামিনের অভাব কিংবা অপুষ্টির প্রধানতম কারণ খাদ্যের অভাব। বেবীফুড আর টনিকের বিজ্ঞাপন এই মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র।**



অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই ঃ

পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যই অপুষ্টি প্রতিরোধের একমাত্র পথ। 1978 সালে সোভিয়েত রাশিয়ার আলমা-আটা শহরে ভারতসহ বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশ '2000 সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-র যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল, তার মূলকথাই এই। অথচ কী সীমাহীন কপটতায় আমাদের দেশের কর্ণধারেরা

এই প্রতিশ্রুতি পালনে নির্লিপ্ত থাকে। ভারতের প্রায় অর্ধেক মানুষ আজও কমবেশী অপুষ্টিতে ভোগে। আমাদের সরকার সদম্ভে ঘোষণা করেন যে ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে। অথচ যে গরীব মানুষেরা মাঠে দিবারাত্র পরিশ্রম করেন, যাদের রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে সোনার ফসল ফলে, আমাদের দেশের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক কিন্তু আজও অভুক্ত থাকে—অপুষ্টি আর আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধি তাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের শিশুরা পর্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেহ মনে রুগ্ন হয়ে পড়ে। অনুৎপাদক ব্যয় ছাপ দিয়ে 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প' বন্ধ করে দেওয়া হয়, অথচ তা গ্রামের মানুষের পুষ্টি জোগানোর কাজে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারতো। এদেশের ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়, অথচ চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি অল্পদামে মানুষের কাছে সরবরাহ করার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় না। বছরে দুবার বেশীমাত্রায় ভিটামিন 'এ' খাওয়ালে অন্ধত্ব নিবারণের পথে এগুনো যায়, প্রতিদিনের লবণে আয়োডিন যুক্ত করলে পাহাড়ী অঞ্চলে গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ করা যায়, সন্তানসম্ভবা মায়েদের আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খাওয়ালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। অথচ এ সমস্ত প্রকল্পগুলি শুধু নামেই চালু আছে, ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে এই সুযোগগুলি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সদর্থক প্রচেষ্টার অভাব দেখা যায়।

একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্নে বিভোর আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার নীচে রেখেই ভারতকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অবাস্তব পরিকল্পনা করেন। একদিকে দেশের 40 ভাগ জমি মাত্র 5 ভাগ লোকের হাতে কুক্ষিগত, দেশের সম্পদ 21টি পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত, অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বেকারী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য আর করের বোঝায় বিপর্যস্ত হয়ে জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্যের ব্যবস্থা করতেও অক্ষম হয়। খাদ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে এই অসাম্য, সম্পদের এই কেন্দ্রীভবন ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার এই ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তিই আমাদের দেশে অপুষ্টির প্রধান কারণ। **অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই তাই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।**

———

জনস্বাস্থ্য প্রকাশন

(নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের একটি প্রকল্প)

পুস্তক তালিকা ঃ

পেটের অসুখ (৩-য় সং)	ডাঃ তাপস সেন	দুই টাকা
অপুষ্টি (২-য় সং)	ডাঃ গোপাল দাস	দুই টাকা
রোগ প্রতিরোধে টিকা (২-য় সং)	ডাঃ সমীর কুণ্ডু	দুই টাকা
এসব ওষুধ খাবেন না (২-য় সং)	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	দুই টাকা
কৃমি সংক্রমণ (২-য় সং)	ডাঃ সুব্রত ধর	দুই টাকা
রক্তাল্পতা (২-য় সং)	ডাঃ কমলেশ দাস	দুই টাকা
জ্বর	ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল	দুই টাকা
কাশি	ডাঃ দুর্জয় দাস	দুই টাকা
প্রসঙ্গ ওষুধ	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	ছয় টাকা
জলবাহিত রোগ	ডাঃ রণবীর পাল	দুই টাকা
মশকবাহিত রোগ	ডাঃ শতদল দাস	দুই টাকা
চিকিৎসা না বিভ্রান্তি ?	ডঃ পি. জি. রায়	দুই টাকা
জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা (২-য় সং)	শ্রী কালিদাস সমাজদার ও শ্রী বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত	দুই টাকা
People's Health Movement —A Manifesto		দুই টাকা

দুমাস পর পর নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আমাদের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

কলিকাতা— বুক মার্ক, নিউ বুক সেণ্টার, মণীষা গ্রন্থালয়, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলাণ্টারী হেলথ এ্যাসোসিয়েশন, পিপলস বুক সোসাইটী, পাতিরাম, কথাশিল্প, শৈব্যা পুস্তকালয় এবং আমাদের কাছে।

নদীয়া — প্রগতি বার্তা, 6/119 কল্যাণী।
বিজ্ঞান দরবার, কাঁচড়াপাড়া।

হুগলী — চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব, নতুন বাজার, চুঁচুড়া।

মুর্শিদাবাদ— মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ,
11/3/এ, কে. কে. ব্যানার্জী রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর।

ত্রিপুরা — জ্ঞান বিচিত্রা, 10 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা।

এছাড়া যে কোনও প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে খোঁজ নিন।

२०১०

জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা : দুই □ মূল্য : দুই টাকা

লেখক পরিচিতি : ডাঃ গোপাল দাস গ্রামাঞ্চলে কর্মরত একজন সমাজ সচেতন তরুণ চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী ।

- ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, জুন, আগষ্ট, অক্টোবর এবং ডিসেম্বর মাসে আমাদের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ।
- 1988 সালের পাঠকসদস্য চাঁদা 15 টাকা । মানি অর্ডার কুপনে নিজের পুরো নাম ও ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন । ড্রাফট এবং চেক "Norman Bethune Janaswasthya Andolan" নামে লিখবেন ।
- বৃহত্তর জনগণের জন্য আমরা বিভিন্ন অডিওভিসুয়াল জিনিষপত্র সংগ্রহ করছি । তৎসহ আছে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠান করার খরচ । **পাঠকসদস্য বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী এ বাবদে কিছু অর্থ সাহায্য পাঠাবেন, এ প্রত্যাশা করছি ।**
- আপনার অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে আমাদের অংশগ্রহণে আপনি কিভাবে সহায়তা করতে পারেন, আমাদের জানান ।
- পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে উপযুক্ত শর্তে বিক্রয় সহযোগী পেতে আমাদের সহায়তা করুন কিংবা আপনি নিজে সংস্থার তরফে এ দায়িত্ব নিন ।
- নিজ নিজ সংগঠনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করুন ! আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে লিখুন ।
- আমাদের বিষয়ে আরও জানতে "জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা" পড়ুন । প্রয়োজনে আমাদের চিঠি লিখুন ।
- **যোগাযোগের ঠিকানা :**

কর্মসচিব, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন,
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
244-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-700 020

'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন' এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস 1/5/1এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700012 হইতে মুদ্রিত।